উপসংহার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

1 2
2 18
3 27
4 43
5 56
6 67

1

হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। শীতের প্রকোপ অল্পে অল্পে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া অদূর বসন্তের বার্তা জানাইয়া দিলেও, সকালবেলায় সোনালী রৌদ্রটুকু এখনও বেশ মিঠা লাগে।

সেদিন সকালে আমি একাকী জানালার ধারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। ব্যোমকেশ প্রাতরাশ শেষ করিয়াই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে দশটা বাজিবে।

খবরের কাগজে দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমার শেষ কিস্তির বিবরণ বাহির হইয়াছিল। কাগজে বিবরণ পড়বার আমার কোনও দরকার ছিল না, কারণ আমি ও ব্যোমকেশ মাোকদ্দমার সময় বরাবরই এজলাসে হাজির ছিলাম। তাই অলসভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভাবিতে ছিলাম–দেবকুমারবাবুর অসম্ভব জিদের কথা। তিনি একটু নরম হইলে হয়তো এতবড় খুনের মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া যাইত; কারণ উচ্চ রাজনীতি পিনাল কোডের শাসন মানিয়া চলে না। কিন্তু সেই যে তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন আবিষ্কারের ফরমুলা কাহাকেও বলিবেন না–সে-জিদ হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। দেশলাই কাঠি বিশ্লেষণ করিয়াও বিষের মূল উপাদান ধরা গেল না। অগত্যা

আইনের নাটিকা যথারীতি অভিনীত হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

চিন্তা ও কাগজ পড়ার মধ্যে মনটা আনাগোনা করিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। দারোগা বীরেনবাবু থানা হইতে ফোন করিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজিত ব্যগ্রতার আভাস পাইলাম।

'ব্যোমকেশবাবু আছেন?'

'তিনি বেরিয়েছেন। কোনও জরুরী দরকার কি?'

'হ্যাঁ–তিনি কখন ফিরবেন?'

'দশটার সময়।'

'আচ্ছা, আমিও দশটার সময় গিয়ে পৌঁছুব। একটা খারাপ খবর আছে।'

খবরটা কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বীরেনবাবু ফোন কাটিয়া দিলেন।

ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম বেলা নটা। মন ছটফট করিতে লাগিল, তবু সংবাদপত্রটা তুলিয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে দশটা বাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, সাড়ে ন'টার পরই ব্যোমকেশ ফিরিল।

বীরেনবাবু ফোন করিয়াছেন শুনিয়া সচকিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি! আবার কি হল?'

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল; কারণ, বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে চায়ের আয়োজন চাই; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময় অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

চায়ের হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট বাহির করিল; একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিতে করিতে বলিল, 'বীরেনবাবু যখন বলেছেন খারাপ খবর, তার মানে গুরুতর কিছু। হয়তো—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে হস্তধৃত দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যোমকেশ মুখ হইতে অ-জ্বলিত সিগারেট নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি! এ দেশলায়ের বাক্স আমার পকেটে কোথা থেকে এল?'

'কোন দেশলায়ের বাক্স?'

ব্যোমকেশ বক্সটা আমার দিকে ফিরাইল। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না, সাধারণ দেশলায়ের বাক্স যেমন হইয়া থাকে উহাও তেমনি, কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছি দেখিয়া ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ধীরস্বরে বলিল 'দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, বাক্সটার ওপর যে লেবেল মারা আছে তাতে একজন সত্যাগ্রহী কুড়ুল কাঁধে করে তালগাছ কাটতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের বাসায়–'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'বুঝেছি, ঘোড়া মার্কা ছাড়া অন্য দেশলাই আসে না।'

'ঠিক। সুতরাং আমি যখন বেরিয়েছিলুম। তখন আমার পকেটে স্বভাবতই ঘোড়া মাকর্গ দেশলাই ছিল। ফিরে এসে দেখছি সেটা সত্যাগ্রহীতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকালিকার এই স্বরাজ-সাধনার যুগেও এতটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কি করে? তারপর গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'পুঁটিরাম '

পুঁটিরাম আসিল।

'এবার বাজার থেকে কোন মার্কা দেশলাই এনেছ?'

'আজ্ঞে, ঘোড়া মার্কা।'

‘কত এনেছ?’

‘আজ্ঞে, এক বাণ্ডিল।’

‘সত্যাগ্রহী মার্কা আনোনি?’

‘আজ্ঞে, না।’

‘বেশ, যাও।’

পুঁটিরাম প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া রহিল; ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ‘মনে পড়ছে, ট্রামে যেতে যেতে সিগারেট ধরিয়েছিলুম, তখন পাশের ভদ্রলোক দেশলাইটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন, আমি না দেখেই পকেটে ফেললুম;–অজিত!’

‘কি?’

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, ‘অজিত, সেই লোকটাই দেশলায়ের বাক্স বদলে নিয়েছে।’ দেখিলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটা কে? তার চেহারা মনে আছে?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না, ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে মাথায় মাঙ্কিক্যাপ ছিল, আর চোখে কালো চশমা–' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বীরেনবাবুকখন আসবেন বলেছেন?

'দশটায়।'

'তাহলে তিনি এলেন বলে। অজিত, বীরেনবাবু আজ কেন আসছেন জানো?'

'না—কেন?'

'আমার মনে হয়-আমার সন্দেহ হয়–'

এই সময় সিঁড়িতে বীরেনবাবুর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, ব্যোমকেশ কথাটা শেষ করিল না।

বীরেনবাবু আসিয়া গভীর মুখে উপবেশন করিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'নিজের দেশলাই দিয়ে ধরান। দেবকুমারবাবুর দেশলায়ের বাক্স কবে চুরি গেল?'

'পরশু'–বলিয়াই বীরেনবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন–'আপনি জানলেন কোত্থেকে? একথা তো চাপা আছে, বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি।'

'স্বয়ং চোর আমাকে খবর পাঠিয়েছে'–বলিয়া ব্যোমকেশ ট্রামে দেশলাই বদলের ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বীরেনবাবু গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তারপর দেশলায়ের বাক্সটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে একটা মারাত্মক কাঠি আছে–বাপ! লোকটা কে আপনার কিছু সন্দেহ হয় না?'

'না। তবে যেই হোক, আমাকে যে মারতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কেন? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা মারতে চাইবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'হয়তো সে মনে করে ব্যোমকেশকে মারতে পারলে তাকে ধরা কঠিন হবে তাই আগেভাগেই ব্যোমকেশকে সরাতে চায়।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার তা মনে হয় না। পুলিসের অসংখ্য কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা বুদ্ধিতে কর্মদক্ষতায় আমার চেয়ে কোনো অংশ কম নয়। বীরেনবাবুর কথাই ধর না। চোরের যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকতে তাহলে সে আমাকে না মেরে বীরেনবাবুকে মারবার চেষ্টা করত।'

প্রশংসাটা কিছু মারাত্মক জাতীয় হইলেও দেখিলাম বীরেনবাবু মনে মনে খুশি হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'না-না—তবে-অন্য কি কারণ থাকতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইটেই ঠিক ধরতে পারছি না। যতদূর মনে পড়ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু কেউ নেই।'

বীরেনবাবু ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি মশায়! আপনি এতদিন ধরে চোর-ছাঁচড় বদমায়েসের পিছনে লেগে আছেন, আর আপনার শত্রু নেই! আমাদের পেশাই তো শত্রু তৈরি করা।'

এই সময় পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। একটা পেয়ালা বীরেনবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা বটে। কিন্তু আমার অধিকাংশ শত্রুই বেঁচে নেই। যা হোক, এবার বলুন তো কি করে জিনিসটা চুরি গেল?'

বীরেনবাবু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, 'ঠিক কি করে চুরি গেল তা বলা কঠিন। আপনি তো জানেন দেশলায়ের বাক্সটা দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমায় একজিবিট ছিল, কাজেই সেটা পুলিসের তত্ত্বাবধান থেকে কোর্টের এলাকায় গিয়ে পড়েছিল। পরশু মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, তারপর থেকে আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সন্দেহের ওপর কয়েকজন আদলি আর নিম্নাতন কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর কিছু হচ্ছে না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে, খোদ গভর্নমেন্টের পর্যন্ত টনক নড়েছে। এখন আপনি একমাত্র ভরসা!'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'খাস ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে হুকুম এসেছে, চোর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, দেশলায়ের বাক্স উদ্ধার করা চাই। এর ওপর নাকি আন্তজাতিক শান্তি নির্ভর করছে।'

'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে যে আপনি এ কাজে ডাকছেন–এতে কর্তৃপক্ষের মত আছে কি?'

'আছে। আপনাকে তাহলে সব কথা বলি। দেশলায়ের বাক্স লোপাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেসটা সি আই ডি পুলিসের হাতে যায়। কিন্তু আজ তিন দিন ধরে অনুসন্ধান করেও তারা কোনও হদিস বার করতে পারেনি। এদিকে প্রত্যহ তিন-চার বার গভর্নমেন্টের কড়া তাগাদ আসছে। তাই শেষ পর্যন্ত বড়সাহেব আপনার সাহায্য তলব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারে সমাধান যদি কেউ করতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিল, তারপর বলিল, 'তাহলে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু–আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

‘আপনি যখন যাবেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।’

‘বেশ–একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আজ আর নয়, কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দিতে হবে।’

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘কিন্তু যতই দেরি হবে–‘

‘সে আমি বুঝেছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাহোক একটা কিছু করলেই তো হবে না। একটা অজানা লোককে ধরতে হবে, অথচ এমন সূত্র কোথাও নেই। যা ধরে তার কাছে পৌঁছুতে পারা যায়। একটু বিবেচনা করে পন্থা স্থির করতে হবে না?’

‘তা বটে—‘

‘ইতিমধ্যে যে লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেন তার চেষ্টা করুন। যদি–’

বীরেনবাবু গম্ভীর মুখে একটু হাসিলেন–‘তিন দিন ধরে অনবরত সে চেষ্টা হচ্ছে, কোনো ফল হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখতে পারেন।’

‘পারব মনে হয় না। তারা হয়তো নির্দোষ। যাক, তাহলে ঐ কথা রইল, কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব; তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে। এ ব্যাপারে আমার

নিজের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে, কারণ চোর মহাশয় প্রথমে আমার ওপরেই কৃপা-দৃষ্টিপাত করেছেন।’

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ বসিয়া বীরেনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া দেশলায়ের বাক্সটা নিজের লাইব্রেরি। ঘরে রাখিয়া আসিল। তারপর পিছনে হাত রাখিয়া গভীর ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল।

এগারোটা বাজিয়া গেলে পুঁটিরাম আসিয়া স্নানের তাগাদ দিয়া গেল, কিন্তু তাহার কথা ব্যোমকেশের কানে পৌঁছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে একটা ‘হুঁ’ দিয়া পূর্ববৎ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় ডাকপিওন আসিল। একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, ‘দেখুন তো এটা আপনার চিঠি কিনা।’

ব্যোমকেশ খামের শিরোনামা দেখিয়া বলিল, ‘হ্যাঁ, আমারই। কেন বল দেখি?’

পিওন কহিল, ‘নীচের মেসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা তাঁর চিঠি।’

‘সে কি! ব্যেমকেশ বক্সী আরো আছে নাকি?’

‘তিনি বললেন, তাঁর নাম ব্যোমকেশ বোস।’

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, ‘ও–তা হতেও পারে বাগবাজারের মোহর দেখছি।–কলকাতা থেকেই চিঠি আসছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে খামে চিঠি কে লিখবে? যা হোক, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে। যদি আমার না হয়—কিন্তু নীচের মেসে ব্যোমকেশ নামে আর একজন আছেন এ খবর তো জানতুম না।’

পিওন প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ কাগজ-কাটা ছুরি দিয়া খাম কাটিয়া চিঠি বাহির করিল, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘আমার নয়। কোকনদ গুপ্ত–অদ্ভুত নাম—কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।’

চিঠিতে লেখা ছিল–

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

ব্যোমকেশবাবু, অনেকদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। চিনিতে পারিকেন তো? কি জানি, অনেকদিন পরে দেখা, হয়তো অধমকে না চিনিতেও পারেন।

আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী, আপনার কাছে আমার জীবন বিক্রীত হইয়া আছে। কিন্তু কর্মের জন্য বহুকাল স্থানান্তরে ছিলাম বলিয়া সে-ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করিকেন।

ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীকোকনন্দ গুপ্ত

চিঠিখানা পড়িয়া আমি বলিলাম, 'এ চিঠি আমাদের পড়া উচিত হয়নি। অবশ্য গোপনীয় কিছু নেই, তবু এমন আন্তরিক কথা আছে যা অন্যের পড়া অপরাধ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বুঝছি। প্রেমিক প্রেমিকার চিঠি চুরি করে পড়ার মত এ চিঠিখানা পড়লেও মনটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বল। চিঠি আমার কিনা যাচাই করা চাই তো। কোকনন্দ গুপ্ত বলে কাউকে আমি চিনি না, আর চিনলেও তার কোনও মহৎ উপকার করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।'

'তাহলে যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'হাঁ। পুঁটিরামকে ডাকি।'

কিন্তু পুঁটিরাম আসিবার পূর্বেই চিঠির মালিক নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের মেসের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি ছিল, ইহাকে কিন্তু পূর্বে দেখি নাই। লোকটি বেঁটে-খাটো দোহারা, বোধ করি মধ্যবয়স্ক–কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই। কপাল হইতে গলা পর্যন্ত মুখখানা পুড়িয়া, চামড়া কুঁচকাইয়া এমন একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্বে তাঁহার চেহারা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটা বিকট মুখোশ পরিয়া আছেন। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, এমন কি চোখের পল্লব পর্যন্ত চিরদিনের

জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায় অনাবৃত নিষ্পলক ভাব দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহজ সাধারণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি দ্বারের নিকট হইতে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বসু। একখানা চিঠি—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আসুন। চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। আপনি এসেছেন–ভালই হল। বসুন। কিছু মনে করবেন না, নিজের মনে করে খাম খুলেছিলুম। এই নিন।'

পত্রটা হাতে লইয়া ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কোকনন্দ গুপ্ত! কৈ আমার তো–' ব্যোমকেশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনার চিঠি নয়? আপনি পড়েছেন নিশ্চয়।'

অপ্রস্তুতভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'পড়েছি, নিজের মনে করে—কিন্তু পড়ে দেখলুম আমার নয়। পিওন বলেছিল বটে। কিন্তু খামের ওপর 'বোস' কথাটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে বক্সী বলে ভুল হয়। জানেন বোধহয়, আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী?'

'জানি বৈকি। আপনি এ মেসের গৌরব; এখানে এসেই আপনার নাম শুনেছি। কিন্তু চিঠিটা আমার কি না ঠিক বুঝতে পারছি না। কোকনদ গুপ্ত নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে বটে, তবু–, যা হোক, আপনি যখন বলছেন আপনার নয়। তখন আমারই হবে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মহৎ লোকের পক্ষে উপকার করে ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'না না, তা নয়—অনেক দিনের কথা, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে না। পরে হয়তো পড়বে।—আচ্ছা, নমস্কার।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ মেসে কত দিন এসেছেন?'

'বেশি দিন নয়। এই তো দিন পাঁচ-সাত।'

'ও'-ব্যোমকেশ হাসিল, 'যা হোক, তবু এতদিনে একজন মিতে পাওয়া গেল। আচ্ছা, নমস্কার। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

ভদ্রলোক আনন্দিতভাবে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর দেশলাই চুরির মামলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবা যাবে। অনেক ভাববার কথা আছে; যে-বনে শিকার নেই সেই বন থেকে বাঘ মেরে আনতে

হবে। আচ্ছা, আমাদের এই দুনম্বর ব্যোমকেশবাবুটকে আগে কোথাও দেখেছ বলে বোধ হচ্ছে কি?'

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'না, ও-মুখ কদাচ দেখিনি। তুমি দেখেছি নাকি?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'উহুঁ। কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়-অনেক দিন। যাকগে, এখন আর বাজে চিন্তা নয়।' বলিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

2

চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না, কিন্তু আজ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সে যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম-কোনও কারণে তাহার একাগ্র চিন্তার পথে বিঘ্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও সে মনকে ঐকান্তিক চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। তারপর সে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ কি হল তোমার! অমন ফিজেট্ করছ, কেন?'

ব্যোমকেশ লজ্জিতভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কি জানি আজ কিছুতেই মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাজে কথা মনে আসছে—'

আমি বলিলাম, 'গুরুতর কাজ যখন হাতে রয়েছে তখন বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কি ইচ্ছে করে বাজে চিন্তা করছি? আজ সকালের ঐ চিঠিখানা—'

‘কোন চিঠি?’

‘আরে ঐ যে কোকনন্দ গুপ্ত। ঘুরে ফিরে কেবল ঐ কথাই মনে আসছে।’

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, ‘ও চিঠিতে এমন কি আছে–’

‘কিছুই নেই। তবু মনে হচ্ছে চিঠিখানা যদি আমাকেই লিখে থাকে–যদি–’

‘ঠিক বুঝলুম না। চিঠির লেখককে তুমি চেনো না, আর একজন লোক সে-চিঠি নিজের বলে দাবি করছেন, তবু চিঠি তোমার হবে কি করে?’

‘তা বটে–কিন্তু চিঠির কথাগুলো তোমার মনে আছে?’

‘খুব গদগদভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া তাতে তো আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে এত দুর্ভাবনা কেন?

‘ঠিক বলেছ’—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, ‘মস্তিষ্ককে বাজে চিন্তা করবার প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, ক্রমে একটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নাঃ—এখন কেবল দেশলায়ের বাক্স ধ্যান জ্ঞান করব। আমি লাইব্রেরিতে চললুম, চা তৈরি হলে ডেকো।’ বলিয়া

লাইব্রেরি ঘরে ঢুকিয়া, যেন বাজে চিন্তাকে বাহিরে রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর বিকাল কাটিয়া গেল; রাত্রি হইল। কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অস্থির বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা দূর হইল না। বুঝিলাম, সে এখনও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে, লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ ব্যোমকেশের ঠেলা খাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। বলিলাম, 'কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওহে, একটা মতলব মাথায় এসেছে—'

মাথার উপর লেপ চাপা দিয়া বলিলাম, 'এত রাত্রে মতলব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শোনো। যে লোক দেশলাই চুরি করেছে, সেই আমাকে মারবার চেষ্টা করছে–কেমন? এখন মনে করা, আমি যদি সত্যিই–'

আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে বলিলাম, কাল রাত্রে তুমি কি সব বলছিলে, শেষ পর্যন্ত শুনিনি।'

ব্যোমকেশ গভীর মুখে কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তা শুনবে কেন? কাল রাত্রে আমার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে দিলুম, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলে। এমন না হলে বন্ধু!'

আমি আৎকাইয়া উঠিলাম, মৃত্যু-সংবাদ! মানে?'

'মানে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার আগে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার।' ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'এখন সওয়া আটটা। ন'টার সময় বেরুলেই হবে।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া কাগজে মন দিল। বুঝিলাম, কাল গভীর রাত্রে উত্তেজনার ঝোঁকে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল এখন আর তাহা সহজে বলিবে না। নিশ্চয় কোনও অদ্ভূত ফন্দি বাহির করিয়াছে; জানিবার জন্য মনটা ছটফট করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়া ভাল করি নাই।

মিনিট পাঁচেক নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশকে খোঁচা দিয়া কথাটা বাহির করা যাইতে পারে কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ সে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাক্স দেশলাই কিনবে?'

‘সে আবার কি?’

‘একজন ভদ্রলোক বিক্রি করতে চান। এই দ্যাখ।’ বলিয়া সে সংবাদপত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে ব্র্যাকেট দিয়া ঘেরা এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে–

এক বাক্স দিয়াশলাই বিক্রি আছে। দাম–এক লক্ষ টাকা। বাক্সে কুড়িটি কাঠি আছে; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হৌন।

আমি যতক্ষণ এই বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম ততক্ষণ ব্যোমকেশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি হতভম্ব মুখ তাহার পানে তুলিতেই সে বলিল, ‘অতি বিচক্ষণ লোক। দেশলায়ের বাক্স চুরি করে এখন আবার সেইটেই গভর্নমেন্টকে বিক্রি করতে চান। গভর্নমেন্ট না কিনলে, জাপান কিম্বা ইটালিকে বিক্রি করবেন। এ ভয়ও দেখিয়েছেন।—চল।’

‘কোথায়?’

‘খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক কিছু পাওয়া যায় কি না। যদিও সে সম্ভাবনা কম।‘

দ্রুত জুতা জামা পরিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম।

'কালকেতু' অফিসে গিয়া কাযাধ্যক্ষ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইতে বিলম্ব হইল না। ব্যোমকেশের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বিজ্ঞাপন বিভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবু এ বিজ্ঞাপনটা সম্বন্ধে আমি জানি। ইন্সিওর-করা খামখানা আমার হাতেই এসেছিল। মনেও আছে, তার কারণ এমন আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আমরা কখনও পাইনি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা লোকটিকে আপনি দেখেননি?'

'না। বললুম তো, ডাকে বিজ্ঞাপনটা এসেছিল। খামের মধ্যে কুড়ি টাকার নোট আর বিজ্ঞাপনের খসড়া ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম; কিন্তু তখন আমাদের কাজের সময়, তাই বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে ডেকে খসড়া তাঁর জিম্মা করে দিই, তারপর ভুলে গিয়েছি। ব্যাপার কি বলুন তো? দেশলায়ের বাক্স দেখে সন্দেহ হচ্ছে, গুরুতর কিছু নাকি?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'আপনাদের কানে পৌঁছুবার মত এখনও কিছু হয়নি। আচ্ছা, প্রেরক সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারেন না? তার ঠিকনা?'

কার্যাধ্যক্ষ মাথা নাড়িলেন, 'খামের মধ্যে নোট আর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

'ইন্সিওর-করা খামে বিজ্ঞাপন এসেছিল বলছেন। খামের ওপরেও প্রেরকের নাম ঠিকানা ছিল না?'

কার্যাধ্যক্ষ সচকিতভাবে বলিলেন, 'ওটা তো খেয়াল করিনি। নিশ্চয় ছিল। অন্তত থাকা উচিত। যতদূর জানি প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলে পোস্ট-অফিসে রেজিস্ট্রি চিঠি নেয় না—'

টেবিলের পাশে একটা প্রকাণ্ড ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া তাহার মধ্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয়গর্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'পেয়েছি–এই, এই নিন।'

সাধারণ সরকারী রেজিস্ট্রি খাম, তাহার কোণে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা রহিয়াছে–
বি কে সিংহ
১৮/১, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকনা টুকিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের পাড়াতেই দেখছি। —এখন তাহলে উঠলুম, অকারণে বসে থেকে আপনার কাজের ক্ষতি করব না–বহু ধন্যবাদ।'

অধ্যক্ষ বলিলেন, 'ধন্যবাদের দরকার নেই; যদি নতুন খবর কিছু থাকে, আগে যেন পাই। জানেন তো, দেবকুমারবাবুর কেস আমরাই আগে ছেপেছিলুম।'

'আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

কালকেতু অফিস হইতে আমরা সোজা সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে ফিরিলাম। ১৮/১ নম্বর বাড়িখানা দ্বিতল ও ক্ষুদ্র, রেলিং-এর উপর লেপ তোষক শুকাইতেছে, ভিতর হইতে কয়েকটি ছেলেমেয়ের পড়ার গুঞ্জন আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভুল ঠিকানা। যা হোক, যখন এসেছি তখন খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক।'

ডাকাডাকি করিতে একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল–'কাকে চান বাবু?'

'বাবু বাড়ি আছেন?'

'না।'

'এ বাড়িতে কে থাকে?'

'দারোগাবাবু থাকেন।'

'দারোগাবাবু? নাম কি?'

'বীরেনবাবু!'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাকরিটার মুখের পানে হ্যাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'ও–বুঝেছি। তোমার বাবু বাড়ি এলে বোলো ব্যোমকেশবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া চলিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি বড় খুশি হয়েছ দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুশি হওয়া ছাড়া উপায় কি! লোকটি এমন প্রচণ্ড রসিক যে মহাপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর রসিকতা করতে বাধে না। এমন লোক যদি আমার সঙ্গে একটু তামাসা করেন তাহলে আমার খুশি না হওয়াই তো ধৃষ্টতা!–তুমি এখন বাসায় যাও, আমি অন্য কাজে চললুম। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পরামর্শ হবে।'

হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িয়ছিলাম, ব্যোমকেশ লাফাইয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

3

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আমাকে তাঁহার প্ল্যান প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্ল্যান শুনিয়া বিশেষ আশাপ্রদ বোধ হইল না; এ যেন অজ্ঞাত পুকুরে মাছের আশায় ছিপ ফেলা, চারে মাছ আসিবে কিনা কোনও স্থিরতা নাই।

আমার মন্তব্য শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘সে তো বটেই, অন্ধকারে ঢ়িল ফেলছি, লাগবে কিনা জানি না। যদি না লাগে তখন অন্য উপায় বার করতে হবে।’

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কমিশনার সাহেবের মত আছে?’

‘আছে।’

‘আমাকে কিছু করতে হবে?’

‘স্রেফ মুখ বুজে থাকতে হবে, আর কিছু নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যাব; কারণ মরতে হলে আজই মরতে হয়, একটা দেশলায়ের বাক্স আর ক’দিন চলে? তুমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে শ্রীরামপুরে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দর্শন করতে পার।’

‘ইতিমধ্যে এখানে যদি কেউ তোমার খোঁজ করে, তাকে কি বলব?’

'বলবে, আমি গোপনীয় কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছি, কবে ফিরব ঠিক নেই।'

'বীরেনবাবু আজ বিকেলে আসতে পারেন, তাঁকেও ঐ কথাই বলব?

কিয়ৎকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, তাঁকেও ঐ কথাই বলবে। মোট কথা, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কইবে না।'

'বেশ–মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম। বীরেনবাবু পুলিসের লোক, বিশেষত এ ব্যাপারে তিনিই এক প্রকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; তবু তাঁহার নিকট হইতেও গোপন করিতে হইবে কেন?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুঝিতে পারিয়াই ব্যোমকেশ বলিল, 'বীরেনবাবুকে না বলার কোনও বিশেষ কারণ নেই, মামুলি সতর্কতা। বর্তমানে তুমি আমি আর কমিশনার সাহেব ছাড়া এ প্ল্যানের কথা আর কেউ জানে না, অবশ্য কাল আরও কেউ কেউ জানতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় কথাটা চেপে রাখাই বাঞ্ছনীয়। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মন্ত্রগুপ্তিই হচ্ছে কূটনীতির মুখবন্ধ; অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকবে।'

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার আধঘণ্টা পরে বীরেনবাবু ফোন করিলেন।

'ব্যোমকেশবাবু কোথায়?'

‘তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।’

‘কোথায় গেছেন?’

‘জানি না।’

‘কখন ফিরবেন?’

‘কিছুই ঠিক নেই। তিন চার দিন দেরি হতে পারে।’

‘তিন চার দিন। আজ সকালে আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন কেন?

ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, ‘তা জানি না।’

তারের অপর প্রান্তে বীরেনবাবু একটা অসন্তোষ-সূচক শব্দ করিলেন, ‘আপনি যে কিছুই জানেন না দেখছি। ব্যোমকেশবাবু কোন কাজে গেছেন তাও জানেন না?’

‘না।‘

বীরেনবাবু সশব্দে তার কাটিয়া দিলেন।

ক্রমে চারিটা বাজিল। পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়া, এবার কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্বদিনের দগ্ধানন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহার হাতে একটি সংবাদপত্র।

তিনি বলিলেন, ‘ব্যোমকেশবাবু বেরিয়েছেন নাকি?’

‘হ্যাঁ। আসুন।’

তাঁহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, পূর্বদিনের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া গল্পগুজব করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও একলা বৈকালটা কি করিয়া কাটাইবি ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, বোসজা মহাশয়কে পাইয়া আনন্দিত হইলাম।

বোসজা আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, ‘আজ কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, সেইটে আপনাদের দেখাতে এনেছিলুম। হয়তো আপনাদের চোখে পড়েনি—’ কাগজটা খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, ‘দেখেছেন কি?’

সেই বিজ্ঞাপন। বড় দ্বিধায় পড়িলাম। মিথ্যা কথা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া বলিতে পারি না, বলিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাই। অথচ ব্যোমকেশ চাণক্য-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মুখ বন্ধ

রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় বোসজা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, ‘পড়েছেন, অথচ ব্যোমকেশবাবু কোনও কথা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন–না?’

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, ‘সম্প্রতি দেশলায়ের কাঠি নিয়ে একটা মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। এই সেদিন দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমা শেষ হল, তাতেও দেশলাই; আবার দেখছি দেশলাইয়ের বাক্সের বিজ্ঞাপন—মূল্য এক লক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বভাবতই সন্দেহ হয়, দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে।’ বলিয়া সপ্রশ্ন চক্ষে আমার পানে চাহিলেন।

আমি এবারও নীরব হইয়া রহিলাম! কথা কহিতে সাহস হইল না, কি জানি আবার হয়তো বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিব।

তিনি বলিলেন, ‘যাক ও কথা, আপনি হয়তো মনে করবেন। আমি আপনাদের গোপনীয় কথা বার করবার চেষ্টা করছি।’ বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। চায়ের সঙ্গে ক্রিকেট, রাজনীতি, সাহিত্য, নানাবিধ আলোচনা হইল। দেখিলাম লোকটি বেশ মিশুক ও সদালাপী—অনেক বিষয়ে খবর রাখেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আপনার কি করা হয়? কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশে প্রশ্নটা অশিষ্ট নয়।'

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'সরকারী চাকরি করি।'

'সরকারী চাকরি?'

'হাঁ। তবে সাধারণ চাকরের মত দশটা চারটে অফিস করতে হয় না। চাকরিটা একটু বিচিত্র রকমের।'

'ও—কি করতে হয়?' প্রশ্নটা ভদ্ররীতিসম্মত নয় বুঝিতেছিলাম, তবে কৌতুহল দমন করিতে পারিলাম না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'রাজ্য শাসন করবার জন্যে গভর্নমেন্টকে প্রকাশ্যে ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়, অনেক খবর রাখতে হয়; নিজের চাকরদের ওপর নজর রাখতে হয়। আমার কাজ অনেকটা ঐ ধরনের।'

বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, 'সি আই ডি পুলিস?'

তিনি মৃদু হাসিলেন, 'পুলিসের ওপরও পুলিস থাকতে পারে তো। আপনাদের এই বাসাটি দিব্যি নিরিবিলি, মেসের মধ্যে থেকেও মেসের ঝামেলা ভোগ করতে হয় না। কতদিন এখানে আছেন??

কথা পাল্টাইয়া লইলেন দেখিয়া আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, 'আমি আছি বছর আষ্টেক, ব্যোমকেশ তার আগে থেকে আছে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথাবার্তা হইল। তাঁহার মুখের এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েক বছর আগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অ্যাসিডের শিশি ভাঙিয়া মুখে পড়িয়া যায়। সেই অবধি মুখের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি উঠিলেন। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা আছে। কেমন লোক বলতে পারেন?'

'কেমন লোক? তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের সূত্রে আলাপ। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তো কিছু জানি না।'

'তাঁকে খুব লোভী বলে মনে হয় কি?'

'মাফ করবেন ব্যোমকেশবাবু, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।'

‘ও-আচ্ছা। আজ চললুম।’ তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলো আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। বীরেনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইনি অনুসন্ধিৎসু কেন? বীরেনবাবু কি লোভী? পুলিসের কর্মচারী সাধারণত অর্থগৃধ্নু হয় শুনিয়াছি। তবে বীরেনবাবু সম্বন্ধে কখনও কোনো কানাঘুষাও শুনি নাই। তবে এ প্রশ্নের তাৎপর্য কি? এবং গভর্নমেন্টের এই গোপন ভৃত্যটি কোন মতলবে আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন?

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই খবরের কাগজ খুলিলাম। যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম তাহা বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার শুরুতেই রহিয়াছে—

“গতকল্য বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীরামপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক যুবকের লাস পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, সুশ্রী চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। পরিধানে বাদামী রংয়ের গরম পাঞ্জাবি ও সাদা শাল ছিল। যুবক কলিকাতা হইতে ৪-৫৩ মিঃ লোকাল ট্রেনে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিল; পকেটে টিকিট পাওয়া গিয়াছে। যদি কেহ লাস সনাক্ত করিতে পারেন, শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধান করুন।“

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। দ্বিতলে নামিয়া একতলার সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে যাইব, পিছু ডাক পড়িল, ‘অজিতবাবু, সক্কাল না হতে কোথায় চলেছেন?’

দেখিলাম, ব্যোমকেশবাবু নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না, বেশ সড়ৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিল–'যাচ্ছি ডায়মন্ড হারবারে–এক বন্ধুর বাড়ি। ব্যোমকেশ কবে ফিরবে কিছু তো ঠিক নেই, দুদিন ঘুরে আসি।'

'তা বেশ। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'কালকেতু'খানা বগলে করিয়া লইয়াছিলাম, বলিলাম, না, গাড়িতে পড়তে পড়তে যাব।' বলিয়া নামিয়া গেলাম।

রাস্তায় নামিয়া শিয়ালদহের দিকে কিছুদূর হাঁটিয়া গেলাম, তারপর সেখান হইতে ট্রাম ধরিয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। নূতন মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে একটু অসুবিধা এই হয় যে ধরা পড়িবার লজ্জাট সর্বদা মনে জাগারুক থাকে। ক্রমশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলে বোধকরি ও দুর্বলতা কাটিয়া যায়।

যা হোক, হাওড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ শ্রীরামপুর পৌঁছিলাম।

হাসপাতালের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অদূরে একটি ছোট কুঠরী নির্দেশ করিয়া দিলেন। কুঠরীটি মূল হাসপাতাল হইতে পৃথক, সম্মুখে একজন পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

কাচ ও তার নির্মিত ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; ভিতরে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে শানের মত লম্বা বেদীর উপরে ব্যোমকেশ শূইয়া আছে—তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত একটা কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখখানা মৃত্যুর কাঠিন্যে স্থির।

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, আবুহোসেন জাগো।'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল।

'কতক্ষণ এইভাবে অবস্থান করছ?'

'প্রায় দুঘণ্টা। একটা সিগারেট পেলে বড় ভাল হত।'

'অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি পিণ্ডি খেতে পারে শুনেছি, কিন্তু সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।'

'ঠিক জানো? মনুসংহিতায় কোনও বিধান নেই?'

'না। তারপর, ক'জন লোক দেখতে এল?'

'মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোক, নিতান্তই লোফার ক্লাশের।'

‘তবে?’

‘এখনও হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আজ সারাদিন আছে।–কালকেও অন্তত সকালবেলাটা পাওয়া যাবে।’

‘দুদিন ধরে এইখানে পড়ে থাকবে? মনে কর যদি বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে না পড়ে? ‘

‘চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি এখন অনবরত বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করছেন।’

‘তা বটে! যা হোক, এখন আমি কি করব বল দেখি।’

‘তুমি এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থাক, যারা আসছে তাদের ওপরে লক্ষ্য রাখ। অবশ্য পুলিস নজর রেখেছে; যিনি এই হতভাগ্যকে পরিদর্শন করতে আসছেন তাঁরই পিছনে গুপ্তচর লাগছে। কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি যদি কোনো চেনা লোক দেখতে পাও, তখনি এসে আমাকে খবর দেবে। আমার মুশকিল হয়েছে চোখ খুলতে পারছি না, কাজেই যাঁরা এখানে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন তাঁদের শ্রীমুখ দর্শন করা হচ্ছে না। মড়া যদি মিটমিট করে তাকাতে আরম্ভ করে তাহলে বিষম হৈ চৈ পড়ে যাবে কিনা।’

‘বেশ। আমি কাছাকাছি রইলুম। পুলিস আবার হাঙ্গামা করবে না তো?’

'দ্বারের প্রহরীকে চুপি চুপি নিজের পরিচয় দিয়ে যেও, তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। তিনি একটি বর্ণচোরা আম; দেখতে পুলিস কনেস্টবল বটে। কিন্তু আসলে একজন সি আই ডি দারোগা।'

বাহিরে আসিয়া ছদ্মবেশী প্রহরীকে আত্মপরিচয় দিলাম; তিনি অদূরে একটি মোতির ঝাড় দেখাইয়া দিলেন। মোতির ঝাড়টি এমন জায়গায় অবস্থিত যে তাহার আড়ালে লুকাইয়া বসিলে ব্যোমকেশের কুঠরীর দ্বার পরিষ্কার দেখা যায়, অথচ বাহির হইতে ঝোপের ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না।

ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিলাম। চারিদিক ঘেরা থাকিলেও মাথার উপর খোলা; দিব্য আরামে রোদ পোহাইতে পোহাইতে সিগারেট ধরাইলাম।

ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, দর্শন-অভিলাষী লোকের সংখ্যাও একটি দুইটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। উৎসুকভাবে তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সকলেই অপরিচিত, চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, অধিকাংশই বেকার লোক একটা নূতন ধরনের মজা পাইয়াছে।

ক্রমে এগারোটা বাজিল, মাথার উপর সূর্যদেব প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। র‍্যাপারটা মাথায় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-ব্যক্তি দেশলাই চুরি করিয়াছে, সে শ্রীরামপুরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দেখিতে আসিবে কেন? আর, যদি বা আসে, এতগুলো

লোকের মধ্যে তাহাকে দেশলাই-চোর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে কিরূপে? সত্য, সকলের পিছনেই পুলিস লাগিবে, কিন্তু তাঁহাতেই বা কি সুবিধা হইতে পারে? মনে হইল , ব্যোমকেশ বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে।

ব্যোমকেশের ঘরের দিকে চাহিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া গেল। একটি লোক দ্রুতপদে আসিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিল; বোধহয় পাঁচ সেকেন্ড। পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল–প্রহরীর প্রশ্নে একবার মাথা নাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

লোকটি আমাদের মেসের নূতন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহাকে দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে তিনি চলিয়া যাইবার পরও কিয়ৎকাল বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে বসিয়া রহিলাম তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সেই ঘরের অভিমুখে ছুটিলাম।

ব্যোমকেশ বোধকরি আমার পদশব্দ শুনিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়া ছিল, আমি তাহার কাছে গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, ‘ওহে, কে এসেছিলেন জানো? তোমার মিতে–মেসের সেই নূতন ব্যোমকেশবাবু।’

ব্যোমকেশ সটান উঠিয়া বসিয়া আমার পানে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল। তারপর বেদী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল, ‘ঠিক দেখেছ? কোনও ভুল নেই?’

‘কোনও ভুল নেই।’

'যাঃ, এতক্ষণে হয়তো পালাল।'

ব্যোমকেশের গায়ে জামা কাপড় ছিল বটে। কিন্তু জুতা পায়ে ছিল না, সেই অবস্থাতেই সে বাহিরের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনিও তখনও সেখানে ছিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গেল? এখনি যে-লোকটা এসেছিল?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'সেই নাকি?'

'হ্যাঁ–তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে?'

'সে কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে এসেছিল, আবার ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের মোটর-বাইকের বন্দোবস্ত করা হয়নি, তাই—'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এর জবাবদিহি আপনি করবেন।—এস অজিত, যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়–হয়তো এখনও–'

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা বাসে চড়িয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনিই তাহলে?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হুঁ।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে?'

'সে অনেক কথা-পরে বলব।'

'আচ্ছা, উনি অত তাড়াতাড়ি পালালেন কেন? তুমি যদি মরে গিয়েই থাকো—'

'উনি শিকারী বেড়াল, ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝেছিলেন যে ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাই চট্‌পট্‌ সরে পড়লেন।'

সাড়ে বারোটার সময় মেসে পৌঁছিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির মুখে মেসের ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছিলেন?'

ম্যানেজার সবিস্ময়ে নগ্নপদে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দু নম্বর ব্যোমকেশবাবু? তিনি তো এই খানিকক্ষণ হল চলে গেলেন। বাড়ি থেকে জরুরী খবর

পেয়েছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তিনিও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি যেন দুঃখ না করেন, শীগগির আবার দেখা হবে।'

4

শিষ্টতার এই প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ঘর কোনটা?'

'ঐ যে পাঁচ নম্বর ঘর।'

পাঁচ নম্বর ঘরের দ্বারে তালা লাগানো ছিল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর চাবি কোথায়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আমার কাছে একটা চাবি আছে, কিন্তু—'

'খুলুন।'

চাবির থোলো পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে ম্যানেজার উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'কি–কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু?'

'বিশেষ কিছু নয়; যে ভদ্রলোকটি এই ঘরে ছিলেন তিনি একজন দাগী আসামী।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তিনি তো কিছুই নিয়ে যাননি দেখছি। বাক্স বিছানা সবই রয়েছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'তিনি কেবল ছোট হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজে নিয়ে গেছেন–আর সবই রেখে গেছেন। বললেন, দুচার দিনের মধ্যে ফিরবেন, আমিও ভাবলুম–'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক কথা। আপনি এবার থানার দারোগা বীরেনবাবুর কাছে খবর পাঠান—তাঁকে জানান যে চোরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তিনি যেন শীগগির আসেন। — আমরা ততক্ষণে এই ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ম্যানেজার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। এই মেসের প্রায় সব ঘরগুলিই বড় বড়, প্রত্যেকটিতে দু' বা তিনজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। কেবল এই পাঁচ নম্বর ঘরটি ছিল ছোট, একজনের বেশি থাকা চলিত না। ভাড়াও কিছু বেশি পড়িত, তাই ঘরটা অধিকাংশ সময় খালি পড়িয়া থাকিত। যিনি মেসে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য ও নিভৃততা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ঘরটি চমৎকার।

ঘরে গোটা দুই ট্রাঙ্ক ও বিছানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যোমকেশ বিছানাটা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'শীতের সময়, অথচ লেপ তোষক বালিশ কিছুই নিয়ে যাননি। অর্থাৎ–বুঝেছ?'

'না। কি?'

'অন্যত্র আর একসেট বন্দোবস্ত আছে।'

ব্যোমকেশ বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি আশা করছি দেশলায়ের বাক্সটা তিনি এই ঘরে রেখে গেছেন?'

'না।–তাহলে তিনি ফিরে এলেন কেন? আমি খুঁজছি। তার বর্তমান ঠিকানা; যদি কোথাও কিছু পাই যা-থেকে তাঁর প্রকৃত নামধামের কিছু ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর সত্যিকারের নাম যে ব্যোমকেশ বসু নয় এটা বোধ হয় তুমিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে।'

'মানে—কি বলে—হ্যাঁ, পেরেছি বৈকি। কিন্তু 'ব্যোমকেশ' ছদ্মনাম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য কি?'

বিছানার উপর বসিয়া ব্যোমকেশ ঘরের এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিল, 'উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা সাধন। অজিত, প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বটা বড় আশ্চর্য। তুমি গল্প-লেখক, সুতরাং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবই জানো। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে নেপথ্য থেকে প্রতিহিংসা সাধন করে মানুষ সুখ পায় না; প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা নিচ্ছে। শত্রু যদি জানতে না পারে কোথা থেকে আঘাত আসছে, তাহলে প্রতিহিংসার অর্ধেক আনন্দই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইনি তাই একেবারে আমার বুকের ওপর এসে চেপে বসেছিলেন। এটা যদি সুসভ্য বিংশ শতাব্দী না হয়ে প্রস্তর-যুগ হত, তাহলে এত ছল চতুরীর দরকার হত না, উনি একেবারে পাথরের মুগুর নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা চলে না, ফাঁসি যাবার ভয় রয়েছে। মোট কথা,

প্রতিহিংসার পদ্ধতিটা বদলেছে বটে। কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বদলায়নি। আজ যে উনি আমার মৃত মুখখানা দেখবার জন্যে শ্রীরামপুরে ছুটেছিলেন, সেও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।' ব্যোমকেশ খামখেয়ালী গোছের হাসিল–'চিঠিখানার কথা মনে আছে তো, সেটা আমারই উদ্দেশ্যে লেখা এবং উনি নিজেই লিখেছিলেন। তার বাহ্য কৃতজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অতি ক্রূর ইঙ্গিত। তিনি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ভাবেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি ভোলেননি–ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। আমরা অবশ্য তখন চিঠির মানে ভুল বুঝেছিলাম, তবু–আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

সেই চিঠিতে লিখিত কথাগুলো যেন এখন নূতন চক্ষে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, 'মনে আছে। কিন্তু তখন কে জানত–; আচ্ছা, লোকটা তোমার কোনও পুরনো শত্রু–না?'

'তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'লোকটা কে তা কিছু বুঝতে পারছি না?'

'বোধহয় একটু একটু পারছি। কিন্তু এখন ও কথা যাক, আগে তাঁর বাক্সগুলো দেখি।'

একটা বাক্সের চাবি খোলাই ছিল, তাহাতে দৈনিক ব্যবহার্যকাপড়-চোপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। অন্যটার তালা লইয়া ব্যোমকেশ দু'একবার নাড়াচাড়া করিয়া একটু চাপ দিতেই সেটাও খুলিয়া গেল। ভিতরে কয়েকটা গরম কোট পাঞ্জাবি ইত্যাদি রহিয়াছে। সেগুলা

বাহির করিয়া তলায় অনুসন্ধান করিতে এক শিশি স্পিরিট-গাম ও কিছু বিনুনিকরা ক্রেপ চুল বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, মুখে যার অ্যাসিড ছাপ মেরে দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে গোঁফ দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় বৈকি। এই সব পরে সম্ভবত ইনি ট্রামে আমার দেশলাই বদলে নিয়েছিলেন।'

ক্রেপ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ আবার কয়েকটা জিনিস দুই হাতে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিল, বলিল, 'কিন্তু এগুলো কি?'

মোমজামার মত খানিকটা কাপড়ে কি কতকগুলা জড়ানো রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সাবধানে সেগুলা মেঝের উপর রাখিয়া মোড়ক খুলিল। একটি আধা আউন্সের খালি শিশি, কয়েকখণ্ড সীলমোহর করিবার লাল রংয়ের গালা ও অর্ধ-দগ্ধ একটি মোমবাতি রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ শিশির ছিপি খুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল, মোমবাতি ও গালা খুব মনোযোগের সহিত দেখিল, শেষে, মোমজামাটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। দেখিলাম সাধারণ মোমজামা নয়, খুব ভাল জাতীয় ওয়াটারপ্রুফ কাপড়–ঈষৎ নীলাভ এবং স্বচ্ছ-আয়তনে একটা রুমালের মত। বর্তমানে তাহার একটা কোণের প্রায় সিকি ভাগ কাপড় নাই–মনে হয় কোনও কারণে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'শিশি, গালা, মোমবাতি এবং ওয়াটারপ্রুফের একত্র সমাবেশ।

মানে বুঝতে পারলে?'

'না–কি মানে?'

'ওয়াটারপ্রুফ থেকেও কিছু আন্দাজ করতে পারলে না?'

হতাশভাবে বলিলাম, 'কিছু না। তুমি কি বুঝলে?'

'সবই বুঝেছি, শুধু ভদ্রলোকের বর্তমান ঠিকানা ছাড়া।–চল, এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে।'

এই সময় ম্যানেজারবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'দারোগাবাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।'

'বেশ।–আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আমার এই মিতেটি যখন চলে গেলেন তখন আপনি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সদর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।'

'ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার চোখে পড়েনি?'

মাথা নাড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে না। নীল রঙের পুরনো ট্যাক্সি—ড্রাইভার একজন শিখ—এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলুম।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে সময় দোরের কাছে আর কেউ ছিল?'

ম্যানেজার ভাবিয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোক কেউ ছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না, তবে আপনাদের চাকর পুঁটিরাম দাওয়ায় বসেছিল। আপনারা বাসায় ছিলেন না, তাই সে বোধহয় একটু—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম থাকা না-থাকা সমান। সে তো আর ইংরিজি জানে না, কাজেই ট্যাক্সির নম্বর চোখে দেখলেও পড়তে পারবে না।–চল অজিত, দেড়টা বাজল, পেটও বাপান্ত করছে। ম্যানেজারবাবু, এবেলা দুটি ভাত আমাদের দিতে হবে। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।'

ম্যানেজার সানন্দে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের! ব্যোমকেশবাবুর-মানে, দুনম্বর ব্যোমকেশবাবুর–ভাত হাঁড়িতেই আছে, তিনি তো খাননি। আপনারা স্নান করুনগে, আমি ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মন্দ ব্যবস্থা নয়। দুনম্বর ব্যোমকেশবাবুর বাড়া ভাত এক নম্বর ব্যোমকেশবাবু খাবেন। দুনিয়াতে এই ব্যাপার তো হরদম চলছে—কি বল অজিত? এখন

দুনম্বর ব্যোমকেশবাবু কোথায় বসে কার ভাত খাচ্ছেন সেইটে জানতে পারলে বড় খুশি হতুম।'

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বীরেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও রকমে অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই বীরেনবাবু উঠিয়া প্রশ্ন-ব্যাকুল নেত্রে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলেন। তাহার সমস্ত দেহ একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকার ধারণ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখনো খাওয়া হয়নি দেখছি।'

'না। খাবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছিলুম। এমন সময় আপনার ডাক পেলুম। —কি হল ব্যোমকেশবাবু? ধরেছেন তাকে?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছু খাবার আনিয়ে দিই।'

'খাবার দরকার নেই। তবে যদি এক পেয়াল চা–?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ। এবং সেই সঙ্গে দুটো নিষিদ্ধ ডিম। —পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম হুকুম লইয়া প্রস্থান করিলে পর, ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাঁহাকে না বলিয়া এত কাজ করা হইয়াছে, ইহাতে বীরেনবাবু একটু

আহত হইলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথা সম্ভব মিষ্ট করিয়া সান্ত্বিনা দিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমি যদি জানতুম তাহলে সে এমন হাত-ফসকে পালাতে পারত না। এখন তাকে ধরা কঠিন হবে। এতক্ষণে সে হয়তো কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে গেছে।'

ব্যোমকেশ মেঝের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে। কারণ সে মার্কা-মারা লোক, ওরকম মুখ নিয়ে মানুষ বেশি দূর পালাতে পারে না। কলকাতা শহরই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তাহলে এখন কর্তব্য কি? তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইস্তাহার জারি করা ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ওটা তো হাতেই আছে। কিন্তু তার আগে-যদি ট্যাক্সির নম্বরটা পাওয়া যেত—'

ইতিমধ্যে পুঁটিরাম চা ইত্যাদি আনিয়া বীরেনবাবুর সম্মুখে রাখিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম, তোমার ইংরিজি শেখা দরকার, আজই একখানা প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক কিনে আনবে। অজিত আজ থেকে তোমাকে ইংরেজি শেখাবে।'

অবাস্তর কথায় বীরেনবাবু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, ‘ও যদি ইংরিজি জানত তাহলে আজ কোনও হাঙ্গামাই হত না।’ পুটরামের দ্বারের কাছে অবস্থিতি ও ট্যাক্সি দর্শনের কথা বলিয়া ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

পুঁটিরাম মুখের সম্মুখে মুষ্টি তুলিয়া সসম্ভ্রমে একটু কাশিল—

‘আজ্ঞে—‘

‘কি?’

‘আজ্ঞে টেক্সির লম্বর আমি দেখেছি।‘

‘তা দেখেছ–কিন্তু পড়তে তো পারেনি।’

‘আজ্ঞে, পড়তে পেরেছি। চারের পিঠে দুটো শূন্য, তারপর আবার একটা চার।’

আমরা তিনজনে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ বলিল, ‘তুই ইংরিজি পড়তে জনিস?

‘আজ্ঞে না।’

‘তবে?’

‘বাংলাতে লেখা ছিল বাবু, সেই জন্যেই তো চোখে পড়ল।’

আমরা চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—’বুঝেছি।’ পুঁটিরামের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘বহুত আচ্ছা! পুঁটিরাম, আজ থেকে—তোমার মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলুম।’

পুটিরাম সহর্ষে এবং সলজ্জে বলিল, ‘আজ্ঞে, বাইরের দাওয়ায় বসেছিলুম, টেক্সিতে বাংলা লম্বর দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। তাইতো লম্বরটা মনে আছে হুজুর।’

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, ‘কিন্তু ব্যাপারটা কি? ট্যাক্সিতে বাংলা নম্বর এল কোত্থেকে?

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘বাংলা নয়–ইংরিজি নম্বরই ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেটা বাংলা হয়ে পড়েছিল। বুঝলেন না? আসলে নম্বরটা ৮০০৮, পুঁটিরাম তাকে পড়েছে। ৪০০৪ I

‘ওঃ–’ বীরেনবাবুর চক্ষুদ্বয় ও অধরোষ্ঠ কিছুক্ষণ বর্তুলাকার হইয়া রহিল।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, ‘তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? বীরেনবাবু, এ তো আপনার কাজ। নীল রংয়ের গাড়ি, চালক শিখ, নম্বর ৮০০৮–খুঁজে বার করতে বেশি কষ্ট হবে না। আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, খবরটা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল।’

‘আমি এখনি যাচ্ছি—‘ বীরেনবাবু উঠিয়া এক চুমুকে চা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, ‘সন্ধ্যের আগেই আশা করি খবর নিয়ে আসতে পারব।’

‘শুধু খবর নয়, একেবারে গাড়ি ড্রাইভার সব নিয়ে হাজির হবেন। ইতিমধ্যে আমি কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন যোগে খবরটা জানিয়ে দিই। তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।’

গমনোদ্যত বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আসামীর নাম বা পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আপনি কোনও খবর দিতে পারেন না?’

‘নির্ভুল খবর এখন দিতে পারি। কিনা জানি না, তবু–’ এক টুকরা কাগজে একটা নম্বর লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আলিপুর জেলে এই কয়েদীর ইতিহাস খুলে হয়তো কিছু পরিচয় পাবেন।‘

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘লোকটা তাহলে দাগী?’

'আমার তো তাই মনে হয়। কাল সকালে তার খোঁজ করে নম্বরটা বার করেছিলুম, কিন্তু তার জেলের ইতিহাস পড়বার ফুরসত হয়নি। আপনি সরকারী লোক, এ কাজটা সহজেই পারবেন–অফিসের মারফত। কেমন?'

'নিশ্চয়।'

বীরেনবাবু কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

5

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে বীরেনবাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ব্যোমকেশ তাহার রিভলবারটা তেল ও ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল।

আমি বলিলাম, 'বীরেনবাবু তো এখনো এলেন না।'

'এইবার আসবেন। ' ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছ ব্যোমকেশ, লোকটার আসল নাম কি? তুমি নিশ্চয় জানো?'

'আমি তো বলেছি, এখনও ঠিক জানি না।'

'তবু আন্দাজ তো করেছ।'

'তা করেছি।'

'কে লোকটা? আমার চেনা নিশ্চয়–না?'

'শুধু চেনা নয়, তোমার একজন পুরনো বন্ধু।'

'কি রকম?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সেই চিঠিখানাতে কোকনন্দ গুপ্ত নাম ছিল মনে আছে বোধ হয়। তা থেকে কিছু অনুমান করতে পার না?'

'কি অনুমান করব। কোকনন্দ গুপ্ত তো ছদ্মনাম।'

'সেই জন্যই তো তাতে আরো বেশি করে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ–আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম–দুটোর কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু মানুষ যখন ভেবে চিন্তে ছদ্মনাম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে অনেকখানি ইঙ্গিত পুরে দেবার চেষ্টা করে। কোকনন্দ শব্দটা তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না? কোনও একটা শব্দগত সাদৃশ্য?'

আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'কি জানি, আমি তো এক কোকোন ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'বলিল, 'কোকনদের সঙ্গে কোকেনের সাদৃশ্য মোটেই কাব্যানুমোদিত নয়, তাই তোমার মন উঠছে না–কেমন? কিন্তু–ঐ বীরেনবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একজন। অজিত, আলোটা জ্বেলে দাও, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে একটি দীর্ঘাকৃতি শিখ। শিখের মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি-গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিঞ্চিৎ সংযত করা হইয়াছে। মাথায় বেণী।

ব্যোমকেশ উভয়কে আদর করিয়া বসাইল।

কালব্যয় না করিয়া ব্যোমকেশ শিখকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল। শিখ বলিল, আজ সকালের আরোহীকে তাহার বেশ মনে আছে। তিনি বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তাহার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শ্রীরামপুরে যান; সেখানে হাসপাতালের অনতিদূতে গাড়ি রাখিয়া তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার লৌটিয়া আসিয়া দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়ে আসিতে আদেশ করেন। কলিকাতায় পহুঁছিয়া তিনি এই বাসায় নামেন, তারপর সামান্য কিছু সামান্ লইয়া আবার গাড়িতে আরোহণ করেন। এখান হইতে বউবাজারের কাছাকাছি একটা স্থানে গিয়া তিনি শেষবার নামিয়া যান। তিনি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরন্তু দুই টাকা বখশিশ দিয়াছেন; ইহা হইতে শিখের ধারণা জন্মিয়াছে সে লোকটি অতিশয় সাধু ব্যক্তি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘তিনি শেষবার নেমে গিয়ে কি করলেন?’

শিখ বলিল, তাহার যতদূর মনে পড়ে তিনি একজন ঝাঁকামুটের মাথায় তাঁহার বেগ্ ও জলের সোরাহি চড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; কোনদিকে গিয়াছিলেন তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘তুমি তোমার গাড়ি এনেছ। সেই বাবুটকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ঠিক সেইখানে পৌঁছে দিতে পারবে?’

শিখ জানাইল যে বে-শক্ পারিবে।

তখন আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া নীচে নামিলাম। নীল রংয়ের গাড়ি বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ৮০০৮ নম্বর গাড়িই বটে। আমরা তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শিখ গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল।

রাত্রি হইয়াছিল। গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া বীরেনবাবু হঠাৎ বলিলেন, ‘আপনার কয়েদীর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। ইনি তিনিই বটে। মাস ছয়েক হল জেল থেকে বেরিয়েছেন।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই। মুখ পুড়েছিল কি করে?’

'ইনি শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বিজ্ঞানবিৎ বলে এঁকে জেল-হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের শিশি ভেঙে গিয়ে মুখের ওপর পড়ে। বাঁচবার আশা ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন।'

আর কোনও কথা হইল না। মিনিট পনেরো পরে আমাদের গাড়ি এমন একটা পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইল যে আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যোমকেশ, এ কি! এ যে আমাদের–'। বহুদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পাড়ারই একটা মেসে ব্যোমকেশের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।*('সত্যান্বেষী' গল্প দ্রষ্টব্য।)

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' চালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'এইখানেই তিনি গিয়েছিলেন?'

চালক বলিল, 'হাঁ।'

একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, এবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।' বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, নামবেন না?'

'দরকার নেই। আমাদের শিকার কোথায় আছে আমি জানি।'

'তাহলে তাকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার।'

ব্যোমকেশ বীরেনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে? দেশলায়ের বাক্সটা চাই না?'

'না না–তা চাই বৈ কি। তাহলে কি করতে চান?'

'আগে দেশলায়ের বাক্সটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর তাকে ধরতে চাই। চলুন, কি করতে হবে বাসায় গিয়ে বলব।'

আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম।

রাত্রি আটটার সময় আমি, ব্যোমকেশ ও বীরেনবাবু একটা অন্ধকার গলির মোড়ে এক ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া বসিলাম। এইখানে একটা গাড়ির স্ট্যান্ড আছে—তাই, আমাদের গাড়িটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমাদের সেই পুরাতন মেস। বাড়িখানা এ কয় বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই, যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল দ্বিতলের মেসটা উঠিয়া গিয়াছে; উপরের সারি সারি জানালাগুলিতে কোথাও আলো নাই।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অপেক্ষা করিবার পর আমি বলিলাম, আমরা ধরনা দিচ্ছি, কিন্তু উনি যদি আজ রাত্রে না বেরোন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেরুবেন বৈ কি। রাত্রে আহার করতে হবে তো।'

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ গাড়ির খড়খড়ির ভিতর চক্ষু নিবদ্ধ করিয়াছিল, সহসা চাপা গলায় বলিল, 'এইবার! বেরুচ্ছেন তিনি।'

আমরাও খড়খড়িতে চোখ লোগাইয়া দেখিলাম, একজন লোক আপাদমস্তক র্‍যাপার মুড়ি দিয়া সেই বাড়ির দরজা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তারপর একবার ক্ষিপ্ত-দৃষ্টিতে রাস্তার দুইদিকে তাকাইয়া দ্রুতপদে দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই হয়। সে অদৃশ্য হইয়া গেলে আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলাম।

সম্মুখের দরজায় তালা বন্ধ। ব্যোমকেশ মৃদু স্বরে বলিল, 'এদিকে এস।'

পাশের যে-দরজা দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, সে দরজাটা খোলা ছিল; আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এইখানে সরু একফালি বারান্দা, তাহাতে একটি দরজা নীচের ঘরগুলিকে উপরের সিঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ব্যোমকেশ পকেট হইতে একটা টর্চ বাহির করিয়া দরজাটা দেখিল; বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় দরজা কীটদষ্ট ও কমজোর হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ জোরে চাপ দিতেই হুড়কা ভাঙিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ভাঙা দরজা স্বাভাবিক রূপে ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ টর্চের আলো চারিদিকে ফিরাইল। ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত, মেঝোয় পুরু হইয়া ধূলা পড়িয়াছে, কোণে ঝুল ও মাকড়সার জাল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা নয়, ওদিকে চল।'

ঘরের একটা দ্বার ভিতরের দিকে গিয়াছিল, সেটা দিয়া আমরা অন্য একটা ঘরে উপস্থিত হইলাম। এ ঘরটা আমাদের পরিচিত, বহুবার। এখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছি। টর্চের আলোয় দেখিলাম ঘরটি সম্প্রতি পরিষ্কৃত হইয়াছে, একপাশে একটি তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, মধ্যস্থলে একটি টেবিল ও চেয়ার। ব্যোমকেশ ঘরটার চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ, এই ঘরটা। বীরেনবাবু, এবার আসুন অন্ধকারে বসে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করা যাক।'

বীরেনবাবু ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্সটা এই বেলা—'

'সেজন্যে ভাবনা নেই। রিভলবার আর হাতকড়া পকেটে আছে তো?'

'আছে।'

'বেশ। মনে রাখবেন, লোকটি খুব শান্ত-শিষ্ট নয়।' আমি এবং বীরেনবাবু তক্তপোশের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশ চেয়ারটা দখল করিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টা তখনও অতীত হয় নাই, বাহিরের দরজায় খুট্ করিয়া শব্দ হইল। আমরা খাড়া হইয়া বসিলাম; নিশ্বাস আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অতি মৃদু পদক্ষেপ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তারপর সহসা ঘরের আলো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সহজ স্বরে বলিল, ‘আসতে আজ্ঞা হোক অনুকুলবাবু। আমরা আপনার পুরনো বন্ধু, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না।’

অনুকুল ডাক্তার–অর্থাৎ দুনম্বর ব্যোমকেশবাবু–সুইচে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। তাঁহার পক্ষ্মহীন চক্ষু দুটি একে একে আমাদের তিনজনকে পরিদর্শন করিল। তারপর তাঁহার বিবর্ণ বিকৃত মুখে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দেখা দিল; তিনি দাঁতের ভিতর হইতে বলিলেন, ‘ব্যেমকেশবাবু যে! সঙ্গে পুলিস দেখছি। কি চাই? কোকেন?’

ব্যেমকেশ মাথা নাড়িয়া হাসিল–’না না, অত দামী জিনিস চেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করব না। আমরা অতি সামান্য জিনিস চাই–একটা দেশলায়ের বাক্স।’

অনুকুলবাবুর অনাবৃত চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘দেশলায়ের বাক্স। তার মানে?’

‘মানে, যে-বাক্স থেকে একটি কাঠি সম্প্রতি ট্রামে যেতে যেতে আপনি আমায় উপহার দিয়েছিলেন, তার বাকি কাঠিগুলি আমার চাই। আপনি তাদের যে মূল্য ধার্য করেছেন অত টাকা তো আমি দিতে পারব না, তবে আশা আছে বন্ধুজ্ঞানে সেগুলি আপনি বিনামূল্যেই আমায় দেবেন।’

‘আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পারছেন বৈকি। কিন্তু হাতটা আপনি সুইচ থেকে সরিয়ে নিন। ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের চেয়ে আপনারই বিপদ হবে বেশি। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি, দুটি রিভলবার আপনার বুকের দিকে স্থির লক্ষ্য করে আছে।’

অনুকুলবাবু সুইচ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মুখে পাশবিক ক্রোধ এতক্ষণে উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘(ছাপিবার যোগ্য নয়) আমার জীবনটা তুই নষ্ট করে দিয়েছিস! তো...’ অনুকুলবাবুর ঠোঁটের কোণে ফেনা গাঁজাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘ডাক্তার, জেলখানায় থেকে তোমার ভাষাটা বড় ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি। দেবে না তাহলে দেশলায়ের বাক্সটা?’

'না—দেব না। আমি জানি না কোথায় দেশলায়ের বাক্স আছে। তোর সাধ্য হয় খুঁজে নে ,-কোথাকার।'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল-'খুঁজেই নিই তাহলে।—বীরেনবাবু, আপনি সতর্ক থাকবেন।'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজোটা সেখানে রাখা ছিল, সেটা দুহাতে তুলিয়া লইয়া সে মেঝের উপর আছাড় মারিল। কুঁজা সশব্দে ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল।

কুঁজার ভগ্নাংশগুলি মধ্য হইতে নীল কাপড়ে মোড়া শিশির মত একটা জিনিস তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ আলোর সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, 'ওয়াটারপ্রুফ, শিশি, সীলমোহর, সব ঠিক আছে-শিশিটা ভাঙেনি দেখছি—বীরেনবাবু, দেশলাই পাওয়া গেছে—এবার চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

6

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘এই কাহিনীর মরাল হচ্ছে-ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। পুঁটিরাম যদি দাওয়ায় বসে না থাকত এবং ট্যাক্সির নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?’

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তা তো বুঝলুম, কিন্তু দেশলাই-চোর যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার কি করে হল?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমার সত্যান্বেষী জীবনে যতগুলি ভয়ঙ্কর শত্রু তৈরি করেছি, তার মধ্যে কেবল তিনজন বেঁচে আছে। প্রথম–পেশোয়ারী আমীর খাঁ, যে মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সূক্ষ্ম ললিতকলায় পরিণত করেছিল। বিচারে পিনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর জেল হয়। দ্বিতীয়–পলিটিক্যাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার, যে সরকারী অর্থনৈতিক গুপ্ত সংবাদ চুরি করে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করত। বছর দুই আগে তার সাত বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয়—আমাদের অনুকূল ডাক্তার। ইনি কোকেনের ব্যবসা এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে দশ বছর জেলে যান। হিসেব করে দেখছি, বর্তমানে কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে। সুতরাং অনুকূলবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে?’

‘তা বটে। কিন্তু এই দগ্ধানন ভদ্রলোকটিই যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার হয়েছিল?’

'না। ওঁর হাঁটার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হয়েছিল বটে। কিন্তু ওঁকে সন্দেহ করিনি। তারপর সেই কোকনন্দ গুপ্তর চিঠিখানা—সেটাও মনে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকনন্দ নামটা এতই অস্বাভাবিক যে ছদ্মনাম বলে সন্দেহ হয়, উপরন্তু আবার 'গুপ্ত'। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের দেশের লোক ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলেই নামের শেষে একটা 'গুপ্ত' বসিয়ে দেয়। তাই, দুনম্বর ব্যোমকেশবাবু যখন চিঠিখানা নিজের বলে স্পষ্টভাবে দাবি করতে না পেরেও নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কোকনদ শব্দটা কোকেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়–তুমি ঠিক ধরেছিল। কিন্তু তখন দুনম্বর ব্যোমকেশবাবুর ওপর কোনও সন্দেহ হয়নি, তাই মনের সংশয় জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর শ্রীরামপুর হাসপাতালে তুমি বললে, উনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখন নিমেষের মধ্যে সংশয়ের সব অন্ধকার কেটে গেল। বুঝলুম উনিই অনুকুলবাবু এবং দেশলাই-চোর।'

'উনি ব্যোমকেশ নাম গ্রহণ করে এ বাসায় উঠেছিলেন কেন?'

'আগেই বলেছি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড় অদ্ভুত জিনিস। ঐ চিঠিখানা আমাকে দিয়ে আমি বুঝতে পারি কি না দেখবার জন্যে উনি এত কাণ্ড করেছিলেন; আর ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই শ্রীরামপুরে আমার মৃত মুখ দেখতে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, ওঁর মুখের চেহারা এমন বদলে গেছে যে আমরা ওঁকে চিনতে পারব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা, জলের কুঁজোর মধ্যে দেশলায়ের কাঠি লুকিয়ে রেখেছেন, এটা ধরলে কি করে?

ব্যোমকেশ কহিল, 'এইখানে অনুকুলবাবুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশলায়ের কাঠি জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে এ কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই, যদি কোনও কারণে তাঁর ঘর খানাতল্লাস হয়, জলের কুঁজোর মধ্যে কেউ তা খুঁজতে যাবে না। আমার সন্দেহ হল যখন শুনলুম, তিনি একটি হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজে নিয়ে চলে গেছেন। হ্যান্ডব্যাগ না হয় বুঝলুম, কিন্তু জলের কুঁজে নিয়ে গেলেন কেন? শীতকালে যে-লোক লেপ বিছানা নিয়ে গেল না, সে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে কি জন্যে? জলের কুঁজো কি এতই দরকারী? তারপর তাঁর বাক্স থেকে যখন গালা ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি বেরুল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। কাঠিগুলি তিনি শিশিতে পুরে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে জড়িয়ে সীলমোহর করে তাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে জলের মধ্যে থেকেও নষ্ট না হয়। অনুকুলবাবুর বুদ্ধি ছিল অসামান্য, কিন্তু বিপথগামী হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল!'

পুঁটিরাম চায়ের শূন্য বাটিগুলা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, ফার্স্টবুক এনেছ?'

লজ্জিতভাবে পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। অজিত, আজ থেকেই তাহলে পুঁটিরামের হায়ার এডুকেশন আরম্ভ হোক। কারণ প্রত্যেক বারই যে ৮০০৮ নম্বর ট্যাক্সিতে আসামী পালাবে এমন তো কোনো কথাই নেই।'